গোধূলীর গান -৩

পুর্বের লেখাটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

হিফজুর রহমান

গ্লাসনস্ত এবং আন্দ্রেই থেকে অ্যান্ড্রু

এপ্রিল, ১৯৯২। মাসের মাঝামাঝি সময়। চীনের ভিসার জন্যে বসে আছি উত্তর কোরীয় রাজধানী পিয়ংইয়ং-এর চীনা দুতাবাসের অপেক্ষা কক্ষে। চীনা ভিসা অফিসারের সাথে কথা হচ্ছে টুকটাক। এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলেন শ্বেতাঙ্গ এক ভদ্রলোক। বয়েস চল্লিশের বেশি নয়। চীনা ভিসা অফিসার ওই ভদ্রলোকের বেশ পরিচিতই মনে হল। চীনা অফিসার আমার কাছে কিছুক্ষণের যতি চেয়ে নিয়ে কথা শুরু করলেন ওই ভদ্রলোকের সাথে। আমার চোখ একটা চীনা পত্রিকার ওপর। কিন্তু, মন চলে গেছে দেশে। ঠিক ঈদের আগের দিন দেশ ছেড়ে এসেছি। হংকং, জাপান হয়ে এখন কোরিয়ায়। এখানে কাজ সেরে যাবো চীন। ওখান থেকে থাইল্যান্ড, তারপর আবার সবুজ-শ্যামল ঘেরা বাংলাদেশ। আরো অনেক দিনই বাইরে থাকতে হবে। অস্থির হয়ে উঠছি। বিভিন্ন দেশ দেখার উদগ্র কৌতুহল নিয়ে বের হলেও ক'দিন পরই দেশে ফেরার তাগিদ শুরু হয়ে যায় আমার মনের ভেতর।

'রাশান এমবাসি' শব্দ দু'টো আমার কানে আঘাত করলো সব অন্যমনষ্কতা ভেদ করে। চোখ তুলে তাকালাম শব্দের উৎসের দিকে। কথা বলছেন সেই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক, চীনা ভিসা অফিসারের সঙ্গে। প্রথমেই ওই আগন্তুককে পরিচিত মনে হয়েছিল। এখনো তাই মনে হচ্ছে। আর কৌতুহল সংবরণ করতে পারলামনা। কাজটা নিয়মসিদ্ধ হবেনা জেনেও ওদের কথার মধ্যে আমার "নোংরা" নাকটা গলিয়েই বসলাম।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্ষমা করবেন, আপনি কি এখানে রুশ দুতাবাসে কাজ করছেন?'

'অবশ্যই!' একটু বিস্ময় মেশানো স্বরে বললেন ভদ্রলোক।

আবারো জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম জানতে পারি?'

'কেন নয়?' বললেন ভদ্রলোক, 'আমার নাম অ্যান্ড্রু।'

আমি এবার একটু কৌতুক মেশানো স্বরে বললাম, 'না, আপনার নাম অ্যান্ড্রু নয়। সম্ভবতঃ আপনার নাম হবে আন্দ্রেই.......'

একটু থমকে গেলেন ভদ্রলোক। অস্বস্থি ছেয়ে গেল তার চেহারায়। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার নাম আন্দ্রেই।' আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অ্যান্ড্রু ওরফে আন্দ্রেই। কি যেন সন্ধান করছেন তিনি। এদিকে আমি তার অস্বস্থি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেও চীনা ভিসা অফিসারও খুব অস্বস্থি মধ্যে পড়ে গেলেন। এইভাবে মনে হয় অনেকগুলো সেকেন্ড, অনেকগুলো মিনিট কেটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আন্দ্রেই-এর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখ ভরে গেল অনাবিল হাসিতে। আন্দ্রেই বলে উঠলেন, 'ওঃ তুমি বাংলাদেশের সেই দুষ্টু ছেলে (ইংরেজী ন্যটি বয় কে বোধহয় এইই বলা যায়), তাই না?'

এক লহমায় প্রায় দেড় বছর পিছিয়ে গেলাম।

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। কোরিয়া সফরের শেষপ্রান্তে পোঁছে গেছি। এখান থেকে যাবো মস্কো। ভিসার জন্যে গেলাম সোভিয়েত দুতাবাসে। ভিসা অফিসার ভিসা ফী চাইলেন। প্রতিবাদ জানালাম। বললাম, 'আমার দেশ থেকে তোমাদের দেশে এর আগে আরো গেছি, এবং কোনবারই ভিসা ফি দিতে হয়নি। এখন দেব কেন?'

ভিসা অফিসার তার দাবিতে অটল। ফি দিতেই হবে।

কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কি জানতে পারি?'

ভিসা অফিসার বললেন, 'আমার নাম অ্যান্ড্রু।'

বড়োসড়ো ধাক্কা খেলাম যেন। সোভিয়েত দুতাবাসে মার্কিন বা ইউরোপীয় নাম! আমার অভিজ্ঞতায় তো তা বলেনা! ঢাকায় রুশ দুতাবাসে কাজও করেছি একসময় প্রেস রিলেশন্স অফিসার হিসেবে। তখনো কোন দিন এইরকম কোন নাম শুনিনি। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে কোন রকমে বললাম, 'নাঃ তোমার নাম বোধহয় আন্দ্রেই হবে......'

এবার অপ্রস্তুত হলেন রাশান ভিসা অফিসার। কোন রকমে বললেন, 'ঠিকই বলেছো, আমার নাম আন্দ্রেই।' বলেই পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু, তুমি এই নাম বুঝলে কি করে?'

তাকে জানালাম, সোভিয়েত বার্তা সংস্থা এপিএন-এর হয়ে কয়েকবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের কথা এবং ঢাকার সোভিয়েত দুতাবাসে ছ'মাস চাকুরীর অভিজ্ঞতার কথা। তারপর একটু তিক্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নিজের নাম পালটে অন্যের নাম ধারণ করছো কেন? তোমার আন্দ্রেই নাম তো অসুন্দর নয়!' কোন জবাব পাইনি সেবার ওই আন্দ্রেই-এর কাছ থেকে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচেভের গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রোইকার খোলা হাওয়া বেশ জোরেশোরেই ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। বাক স্বাধীনতা আর ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে তছনছ হয়ে যাচ্ছিল সব মানবিক মুল্যবোধ। সম্ভবতঃ সেই ধাক্কার জোয়ারেই আন্দ্রেই হতে চেয়েছিলেন অ্যান্ড্রু।

১৯৯০ সালে আন্দ্রেইকে আঘাত করে কোন লাভ যে হয়নি সেটা এসে বুঝলাম ১৯৯২ সালে। আমাকে বাংলাদেশের "দুষ্টু ছেলে" বলে আন্দ্রেই পরিবেশ হালকা করার প্রয়াস চালালেও সেটা হয়নি। বরং পরিবেশ আরো ভারি হয়েছে, আড়ষ্ট হয়েছে। ভাবছিলাম, আপন সমৃদ্ধ সংস্কৃতিচ্যুত হবার বেদনা কি আন্দ্রেইদের বুকে একটুও বাজেনা? খোলা হাওয়া বলে যতোই উন্মাতাল নৃত্য করিনা কেন, তার পেছনের শৈত্যপ্রবাহ এড়াই কি করে?

আন্দ্রেই আর আন্দ্রেই থাকলোনা। ওই সোভিয়েত ইউনয়নও ভেঙে তেরোখানা হয়েছে। এখন আন্দ্রেই কোথায় আছে, কেমন আছে জানিনা। মেদবেদেভ-পুতিনদের রাশিয়ায় এখনো কি একজন আন্দ্রেই আছে? বড়ো জানতে ইচ্ছে করে।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ভাঙনের স্পষ্ট ধ্বনি শুনছিলাম। পুরো সমাজটাই যেন ক্ষয়াটে হয়ে গিয়েছিল। আগের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ১৯৯০-এর সোভিয়েত ইউনিয়নকে মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই। অবাক হয়ে ভাবছিলাম শুধু, এমনটা হয় কি করে? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৭০ বছরের ইতিহাস কি করে মিথ্যে হয়ে গেল, মাত্র কয়েকটা বছরে! ১৯৯০ সালে মস্কোতে, লেনিনগ্রাদে নৈতিক অবক্ষয়ের যে সর্বগ্রাসী রুপ দেখেছিলাম, তাতে শিউরে ওঠা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা। সেই সময়েই মস্কোতে পরিচয় হয়েছিল পর্তুগালের অকশেত সিটি মেয়র মিগুয়েল বইয়ারো ও তার স্ত্রী মানুয়ালার সাথে।

গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রোইকার সোভিয়েত ইউনিয়নে মানবতার ক্লিষ্ট রুপ দেখে হতাশ মিগুয়েল শুধু মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড।'

বাই জিয়ে থেকে জ্যাক

১৯৯২ সালের এপ্রিলেই কোরিয়া থেকে চীনে গিয়ে আরেকটা আপন সংস্কৃতিচ্যুতির ধাক্কা খেলাম। কোরিয়ায় বেশ ব্যস্ত কর্মসুচির ফলে খানিকটা ক্লান্তই হয়ে পড়েছিলাম। তাই খুব সক্কালে বেইজিং বিমানবন্দরে নেমেই চটজলদি হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। র‍্যাডিসন

গ্রুপের হোটেল মভেনপিকে (উচচারণ আরেকটু অন্যরকম হবে) আমার বুকিং ছিল। সোশ্যাল সায়েনটিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, আমাকে হোটেলেরই কেউ রিসিভ করবে। যথারীতি ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ার পার হয়ে ইতিউতি চাইতে শুরু করলাম, হোটেলের কাউকে পাওয়া যায় কি না! একটু আতঙ্কও কাজ করছিল। কারণ, চীনে এই প্রথমবার এসেছি। ওদের ভাষা মোটেও জানিনা। তবুও ভরসা ছিল, কেউ না এলেও হোটেলে পৌঁছুনো যাবে। কারণ, হোটেলটা এয়ারপোর্টের কাছেই, আর এয়ারপোর্টে যেসব ট্যাক্সি পাওয়া যায়, তারা মোটামুটি ইংরেজী জানে। এইসব আতঙ্ক আর চিন্তা-ভাবনার মাঝেই দেখলাম একটা ছোট্ট প্ল্যাকার্ড হাতে এক চীনা যুবক দাঁড়িয়ে। ওর হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা, "মিঃ রাহমান, ফ্রম বাংলাদেশ"। চটজলদি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একগাল হাসি উপহার দিয়ে যুবক সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'মিঃ রাহমান?' আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাতেই ও ওর পরিচয় বিশদ করলো, 'আমার নাম জ্যাক। মভেনপিক হোটেল থেকে এসেছি।'

আবারো আমার বিস্মিত হবার পালা। চেহারা দেখেতো যুবককে চীনাই মনে হয়। কিন্তু, এর নামও ইউরোপীয় নামের মতো কেন? তবে, এবার বিস্ময় একটুক্ষণের জন্যে দমিয়ে রাখারই সিদ্ধান্ত নিলাম। হোটেলের মাইক্রোবাসে চড়ে বসলাম আমরা। জ্যাক জানালো, হোটেলে পৌঁছুতে বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সময় লাগবে।

চলত চলতে বেইজিং শহরতলীর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখছিলাম। এরই মধ্যে রাস্তার ধারে কখনো কখনো বিশাল সব বিলবোর্ডে কোন বিখ্যাত কোরীয় বা জাপানী কোম্পানীর বিখ্যাত সব ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু বিস্মিতই হলাম ওইসব সামগ্রীর বিজ্ঞাপন চীনে দেখে। অবশ্য বিমান বন্দরেও কোরীয় হিউন্দে কোম্পানীর নাম লেখা সব লাগেজ ট্রলি দেখেও বিস্ময় জেগেছিল আমার মনে। হোটেলের পথে চলতে চলতে ভাবছিলাম, কি হচেছ এই দেশগুলোতে?

জ্যাক আমাদের নীরবতা ভঙ্গ করলো। সামনের আসন থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্ষমা করবেন মিঃ রাহমান, আপনি কি মুসলমান?' আমার দিক থেকে ইতিবাচক উত্তর পেয়ে ওর মুখে যেন হাসির ফুল ফুটলো। আবারো আমার দিকে হাত মেলানোর ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো ও, 'আমিও মুসলমান, মিঃ রাহমান।'

ওর সাথে হাত মেলালাম আমি। কিন্তু, সুযোগটা নিতেও ছাড়লাম না। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে, তুমি যে বললে তোমার নাম জ্যাক? তুমি কি চাইনীজ নও?'

জ্যাক এবার বললো, 'না, আমি চাইনীজই এবং আমি একজন চীনা মুসলমান।'

আমার পাল্টা প্রশ্ন, 'তবে তোমার নাম জ্যাক কেন?'

ও জবাব দিল, 'আমার আসল নাম তো জ্যাক নয়। আমার নাম বাই জিয়ে। কিন্তু, বিদেশী হোটেলে চাকুরী পাবার জন্যে ইংরেজী নাম নিতে হয়েছে। নাম না পাল্টালে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাওয়া সম্ভব নয়।'

পিয়ংইয়ং-এ আন্দ্রেই ওরফে অ্যান্ড্রু'র ধাক্কার পর এই ধাক্কাটাও বড় কম মনে হল না। জ্যাক বা বাই জিয়ের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম, চীনে তখন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর কারখানা বসার ধুম লেগেছে। আ ন্তর্জাতিক বাজারের জন্যে চীন এখন খুব প্রয়োজনীয় একটা নাম। আমরা আগেও চীনের তৈরী অনেক জিনিষপত্র ব্যবহার করতাম। কিন্তু, সেগুলো একেবারে তাদের দেশজ শিল্পেরই পণ্য ছিল। আর তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের গরবাচেভের মতোই দেং জিয়াও পিং এর গতিশীল নেতৃত্বে চীনের সব দরজা খুলে মুক্ত হাওয়ার ঝলকানী লাগতে শুরু করেছে। সস্তা শ্রম দিয়ে চীনারা খুব সহজেই আ ন্তর্জাতিক বেনিয়াদের আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। তাতে একধরণের উন্নতিতো চীনে হচ্ছেই। এখন বলা যায় চীন অনেকই উন্নতি করেছে।

কিন্তু, চীনের উন্নতি হচ্ছে, এই কথা বলাতে তখন জ্যাক আমার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করলো। ও বললো, 'দেখ, এইসব করে শহরগুলোতে একধরণের উন্নতির মেকআপ লেগেছে ঠিকই। কিন্তু, কৃষি বিপ্লবের দেশ চীনের গ্রামগুলোতে এখন এক নীরব দারিদ্র ভর করতে শুরু করেছে। এমনকি শহরগুলোতেও সাধারণ চীনারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে সমর্থ হচ্ছেনা।'

চীনের একটি মসজিদে চাইনিজ মুসলিমরা জুম্মার নামাজ পড়ছে

চরম দুশ্চি ন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে হোটেলে পৌঁছুলাম। জ্যাক'কে বললাম, 'তুমি কি আমার সাথে পরে রুমে দেখা করতে পারো?'

'না,' জ্যাক জানালো, 'আমরা হোটেল অতিথিদের কক্ষে যেতে পারি না। তবে, আমার ডিউটি অফ হবার পর তুমি ইচেছ করলে হোটেলের বাইরে আমার সাথে দেখা করতে পারো।'

জ্যাক-এর ডিউটি অফ হয় দুপুর তিনটেয়। আমারও কাজ শেষ হয়ে যাবে প্রতিদিন প্রায় তিনটের দিকেই। তিন দিন থাকবো বেইজিংয়ে। মুহূর্তের মধ্যেই রফা করে ফেললাম ওর সাথে। আমরা প্রতিদিন বিকেলে একত্র হবো। তারপর শহর দেখতে বেরোব। জ্যাক হবে আমার গাইড। আমি ওকে প্রস্তাব দিলাম, 'তোমাকে আমি কিছু ফী-ও দিতে চাই আমার গাইড হবার জন্যে।'

জ্যাক সবিনয়ে জানালো, 'ওর কোন ফী প্রয়োজন নেই। একজন মুসলমান ভাইকে একটু সাহায্য করতে পেরেই সে খুব খুশী।' একটু ইতস্ততঃ করে জ্যাক আবার বললো, 'তুমি অনুমতি দিলে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকেও সঙ্গে নিতে পারি। ও আরো ভাল ইংরেজী বলতে পারে।'

আমি আপত্তি জানানোর কোন কারণ খুঁজে পেলামনা।

পরদিন আমার কাজ সেরে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচিছ। প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে তখন। এমন সময় ডোর বেল বেজে উঠলো।

দরোজা খুলে প্রায় চমকে উঠলাম। এক সুন্দরী চীনা তরুণী দাঁড়িয়ে, মুখে একগাল হাসি। ও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চমৎকার ইংরেজীতে বলে উঠলো, 'মিঃ রাহমান, দিস ইজ রুথ, গার্লফ্রেন্ড অভ জ্যাক।'

আমি কোনরকমে বিস্ময় সামলে হাত মিলিয়ে নিয়ে বললাম, 'প্লিজ, কাম অন ইন!'

রুথ বললো, 'না, আমি ঢুকছিনা। জ্যাক নিচে দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্যে। আমিও নিচে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।' আমি সায় জানাতেই রুথ চলে গেল। মনে মনে জ্যাক-এর বান্ধবী ভাগ্যে ইর্ষান্বিত হলাম। জ্যাক আমাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল, রুথ খ্রীষ্টান এবং ওর চীনা নাম ঝু ঝু ওয়েই। রুথও অন্যসব চীনা তরুণ-তরুণীর মতো ক্যারিয়ারের চি ন্তা করে নিজের নাম পালটে ইংরেজী করে ফেলেছে।

রুথ-এর কথামতো বেরিয়ে হোটেলেরই একটা শাটল বাস ধরে শহরের মধ্যে এসে পড়লাম। জ্যাককে বলে রেখেছিলাম, প্রথমেই তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে যাবো। তারপর যাবো ফরবিডেন সিটি দেখতে। সেই কথা অনুযায়ী এসে পড়লাম তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে। স্কোয়ারের আন্ডারপাসগুলোতে ভিখারীর ভিড় দেখে আর প্রচন্ড বিস্মিত হলামনা। অবক্ষয়ের মস্কোতেও ভিখারীর ভিড় দেখেছি । সুতরাং, বেইজিংয়েও তার ব্যাতিক্রম হবে কেন? জানিনা এখন কেমন আছে চীন-বএর ভিখারীরা।

জ্যাক জানালো, নব্বইএর দশকের শুরুতেই দেং জিয়াও পিংকে টালমাটাল করে তুলেছিল যে ছাত্র আন্দোলন, সেই ছাত্র আন্দোলনের কথা। ও জানালো চুপি চুপি, এই তিয়েন আন মেন স্কোয়ার থেকেই কতো ছাত্র যে হারিয়ে গেছে চিরতরে, কে জানে? চুপচাপ ঘুরছিলাম এদিক ওদিক, আর ভাবছিলাম ওই ছাত্রদের কথা যারা জীবন বাজি রেখে গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করেছিল। তারপর, সরকারের লৌহহাতের থাবা এসে সব নিস্তব্ধ করে দেয়। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। জ্যাককে বললাম, 'চলো যাই।' তখন সূর্য প্রায় অস্তাচলে যেতে বসেছে।

জ্যাক আর রুথও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমার মনের বেদনার কথা।

আগেই ঠিক করা ছিল, একদিন রাতে আমরা একেবারেই স্থানীয় কোন রেস্তোরাঁয় খাব। সেই কথামতো বেইজিং থেকে থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবার আগের রাতে আমরা আমাদের হোটেলের খুব কাছেই একটি অতি স্থানীয় (আমাদের পাড়া বা মোড়ের মতো) রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। ঠিক করা ছিল, আমরা টিপিক্যাল চীনা খাবার ভাব, আর মেনু ঠিক করবে রুথ। আমিও ভাবলাম অ্যাতোদিন প্রায় ইউরোপীয় খাবার খেতে খেতে স্বাদটা অন্যরকম হয়ে গেছে। ফলে, চীনা খাবার বোধহয় মন্দ লাগবে না। রুথ অর্ডার দিল, বেশ নটঘটে সব চীনা নাম। প্রথমে এলো একপ্রকারের ভেজিটেবল স্যুপ, যার ওপর ভাসমান ছিল কিছু সয়া চীজ। সেই সঙ্গে এলো তিন বোতল চীনা বিয়ার। কিন্তু, তারপর যা এলো তাতে চক্ষু চড়কগাছ হওয়া ছাড়া তো কোন উপায় ছিলনা। প্রথমে এলো তিন প্লেট ভর্তি রীতিমতো ধোঁয়া ওঠা গুগলি, সঙ্গে কয়েকটা টুথ পিক। জানলাম, ওই টুথপিক দিয়ে গুগলিগুলোর ভেতর থেকে মাসল বের করে খেতে হয়। রুথ আর জ্যাকের মুখভাব দেখে মনে হলো, এর চেয়ে উপাদেয় কোন খাবার আর হতেই পারে না। আমিও হার মানা বাঙালী নই। ওদের মতো করে খাবার চেষ্টা করি আর ভাব দেখাই সত্যিই দারুণ উপাদেয় খাবার। আর ওই খাবার গলা দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া থেকে বাঁচার জন্যে গলায় ঢেলে দিই খানিকটা বিয়ার।

মনে মনে ভাবলাম এই খাবারেই দুর্গতি শেষ হলে হয়! রুথকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরকম উপাদেয় খাবার আরো কিছু বলেছো না কি?'

রুথ হাসতে হাসতে বললো, ‘অবশ্যই।’ রুথের হাসি যেন আমার বুকে পেরেক ঠুকে দিল। এমনিতে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব একটা বাছ-বিচার করার রেকর্ড আমার নেই। কিন্তু, এই অতি-চীনা খাবার আমার যেন কিছুতেই সইছিলনা।

এবার এলো ছোট ছোট মুরগীর রানের ভুনার মতো কিছু একটা। রুথ আমার মনে অনেক কষ্ট তুলে জানালো, ‘এটা ফ্রগ লেগ। খুবই মজার খাবার!’

মনে মনে দু’বার “আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না” গেয়ে এবং যা আছে কপালে বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ফ্রগলেগস-এর ওপর। দেখলাম নেহাৎ মন্দ নয়! সেই সঙ্গে চললো দেদার বিয়ার। এরই মধ্যে রুথ আমাকে চপ স্টিক দিয়ে খাওয়া শেখাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালালো কয়েকবার। আসলে এই কাঠি দিয়ে খাওয়াটা ইহ জীবনে আর রপ্ত করা হয়ে উঠলো না।

পাশের টেবিলেই ছিল একঝাঁক প্রাণবন্ত চীনা তরুণ-তরুণী। বাস্তব ছিল এই যে, ওই রেস্তোরাঁয় কিম্ভুতকিমাকার অ-চীনা ছিলাম একমাত্র আমিই। তাই ওরা মাঝে মধ্যেই আমাদের দিকে ঘুরে দেখছিল। জ্যাক জানালো, বিভিন্ন কোম্পানীতে কর্মরত এবং মোটামুটি অবস্থাপন্ন চীনা তরুণ-তরুণীরা এই ধরণের রেস্তোরাঁয় উইক এন্ডে আসে এবং বেজায় মজা করে। একসময় আমাদের দুই টেবিল এক হয়ে গেল। তখন খাবার আর কিছুই বাকি ছিলনা। বাকি ছিল কেবল পানীয়। রাতও তখন মধ্যযামের দিকে গড়াতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে পরিচয় হলো লী শিয়েন চি-এর সাথে।

ওদের নেশা তখন বেশ জমজমাট, ফলে সবারই জড়তা কেটে গেল এবং বেশ খোলা মেলা কথাও বলা শুরু করলো। ওদের কথার শুরুতে একটু শঙ্কিতই হয়ে পড়েছিলাম আমি। খোদ বেইজিংয়ের মাঝখানে একদল বিদ্রোহীর মাঝখানে বসে মোটেও স্বস্তি বোধ করছিলাম না। লী শিয়েন চি চাইনিজ এয়ারলাইন্সের একজন কর্মী। লী আর ওর বন্ধুরা বলতে শুরু করলো, ‘দেং জিয়াও পিং সিআইএ’র এজেন্ট। চেয়ারম্যান মাও-এর সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভূলুণ্ঠিত করাই হচ্ছে তার মূল অ্যাসাইনমেন্ট। এইসব তথাকথিত আধুনিকায়ন কর্মসূচি দেশকে বিদেশি শক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়ার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।’

চীনা গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে বেধড়ক ধোলাই খাবার আশংকা মাথায় নিয়েও লী-এর কাছে আমার প্রশ্ন রেখেছিলাম, ‘তোমার মতো এরকম মনোভাব ক’জন পোষণ করে?’

লী তো রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললো, ‘ক’জন মানে? আমাদের মতো ইয়ং জেনারেশনের সবাইই আমাদের মতো ভাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ওরা হয়তো সফল হয়েছে, কিন্তু চীনে হবে না। আমাদের আন্দোলন চলবেই এবং আমরা সফল হবোই।’

লী এবং তার বন্ধুদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস দেখেছিলাম, সেটাকে আহত করার কোন ইচ্ছে আমার ছিলনা। মানুষ তো বাঁচেই স্বপ্নের ঘোরে বা স্বপ্নের জোরে। লী এবং তার বন্ধুরা নাহয় সেই স্বপ্ন কিছুদিন দেখলোই।

এখন অ্যাতোদিন পরে মনে প্রশ্ন জাগে লী শিয়েন চি এবং তার বন্ধুরা কি এখনো সেই রেস্তোরাঁয় যায় উইক এন্ডে? সেরকম স্বপ্ন কি দেখে আজো?

লাইফ ইজ ভেরি আনফেয়ার

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম একটা প্রশিক্ষণ নেবার জন্যে। সেই “লিডারশীপ ও ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কোর্স”-এর (এই প্রসঙ্গে পরে কিছু লিখার ইচ্ছে রইলো) কনসালটেন্ট চার্লি রবিনসন ছিলেন একজন প্রচন্ড আশাবাদী মানুষ। সেই চার্লি রবিনসনও একদিন বলে উঠেছিলেন, ‘লাইফ ইজ ভেরি আনফেয়ার মাই ফ্রেন্ড!”

[প্রিয় পাঠক, আগেই বলে নিয়েছিলাম, এই স্মৃতিচারণমুলক কলামটি লিখতে গিয়ে প্রায়শঃই বিষয় থেকে বিষয়া ন্তরে যাবো। তাই করছি। তবে, কারো খুব বেশি খারাপ লাগলে ভেবে দেখবো নতুন করে কি করা যায়? – হিফজুর রহমান।

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ১৭/০৭/২০১১, ইমেইল # hifzur@dhaka.net

হিফজুর রহমানের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন